# সফর মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

ঈমান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। আমরা যেন ঈমানের উপর কায়েম থাকতে পারি তাই দয়া করে মায়া করে আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

“নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।”

আমরা যেন ঈমানের উপর কায়েম থাকতে পারি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে দু‘আ করতে বলেছেন এবং আরো আল্লাহর মেহেরবানী যে তিনি আমাদেরকে দু‘আ কিভাবে করতে হবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। এমনকি এই দু‘আ দৈনিক কমপক্ষে বত্রিশবার বলা জরুরী করে দিয়েছেন। দু‘আ হলোঃ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ। “হে আল্লাহ আমাকে ঈমানের উপর সিরাতে মুস্তাক্বিমের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম রাখো।” এই হলো এই দু‘আর আসল অর্থ।

আল্লাহর রাসূল সা. বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাবধান করেছেন। এই সমস্ত আক্বীদাকে শিরক বলেছেন। সফর মাসের ব্যাপারেও আল্লাহর রাসূল সা. সাবধান করে গেছেন। কেননা এই মাসকে নিয়ে কিছু আক্বীদা রয়েছে যা ঈমান বিধ্বংসী। নিম্নে এই মাস এবং তার সাথে সম্পর্কিত ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

**ক. আখেরী চাহার শোমবাহ**
**খ. আক্বীদা সম্পর্কিত বিষয়**

## ক. আখেরী চাহার শোমবাহ

আখেরী চাহার শোমবাহ কথাটি ফার্সি। এর অর্থ শেষ বুধবার। সাধারণ পরিভাষায় আখেরী চাহার শোমবাহ বলে সফর মাসের শেষ বুধবারকে বোঝানো হয়ে থাকে। বলা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অসুস্থতার মধ্যে রবিউল আওয়াল মাসের শুরু ভাগে ইনতিকাল করেন, সে অসুস্থতা থেকে সফর মাসের শেষ বুধবারে অর্থাৎ আখেরী চাহার শোমবায় কিছুটা সুস্থতা বোধ করেছিলেন, তাই এ দিবসটিকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। অথচ এ তথ্য সহীহ নয় বরং ও বিশুদ্ধ তথ্য হল, এ বুধবারেই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। কাজেই যে দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা বেড়ে যায়, সেদিন ইহুদী প্রমুখদের জন্য খুশির দিন হতে পারে, মুসলমানদের জন্য নয়। অতএব, সফর মাসের শেষ বুধবার অর্থাৎ আখেরী চাহার শোমবাহকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা এবং ঐ দিন ছুটি পালন করা জায়িয হবে না। [সূত্র : ফাতাওয়া রাহীমিয়া, খণ্ড ১]

শুধু তাই নয় এই দিনে অনেকে একটি নামায আবিষ্কার করা হয়েছে। চাশতের সময়। যা শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নাই। বিভিন্ন মুসলমান এই দিনে ছুটি পালন করে খুশিতে। খুবই আফসোসের বিষয় আল্লাহর রাসূলের সা. অসুস্থতা বেড়ে গেলো যেই দিনে ঐ দিনে মুসলমান খুশি উদযাপন করছে। এর চেয়ে কষ্টের বিষয় আর কী হতে পারে?!

## খ. আক্বীদা সম্পর্কিত বিষয়

নবীয়ে কারীম সা. বললেন, *“লা আদওয়া, ওয়ালা তিয়ারতা, ওয়ালা হামাতা, ওয়ালা সফর।”* অর্থাৎ, সংক্রামক বলে কোন রোগ নেই, কোন অশুভ নেই, যে মরে যাবে সে আর দুনিয়াতে ফিরে আসবে না, তোমরা সফর মাসকে অশুভ মনে করো না।

এখানে চারটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। নিচে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলোঃ

### ১. সংক্রামক বলে কোন রোগ নেই

আল্লাহর রসূল সা. বলেন, তোমরা যে বলো সংক্রামক রোগ বা ছোঁয়াচে রোগ আছে এটা ইসলাম সমর্থন করে না। কোন এক ব্যক্তি একবার নবীকে সা. প্রশ্ন করছিলেন, হুজুর আপনি যে বলেন ছোঁয়াচে রোগ নেই তাহলে একটা উঠের যখন চুলকানী হয় তখন এর আশে-পাশের উঠগুলোরতো হয়, এটা কেন? আল্লাহর রসূল সা. বললেন, তাহলে বলো প্রথম উঠেরটা কিভাবে হলো? প্রথম উঠের চুলকানী যেভাবে হয়েছে আশে-পাশেরগুলোর ঐভাবেই হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম উঠের চুলকানী রোগ আল্লাহ দিয়েছেন এবং বাকীগুলোকেও আল্লাহই দিয়েছেন।

একবার এক কুষ্ঠ রোগীকে আল্লাহর রসূল সা. নিজের প্লেটে খানায় শরীক করলেন। আর দুর্বল ইমানওয়ালাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহর রসূল সা. বললেন, “ফিররু মিনাল দুযাম কা ফিরারিকা মিনাল আসাদ।” বাঘ বা সিংহ দেখলে তোমরা যেভাবে পালাও এভাবে তার থেকে দূরে পালাও। কেননা তোমাকে যদি আল্লাহ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত করে তাহলে তোমার দুর্বল ঈমান হওয়ার কারণে তুমি ভাবতে পারো যে তার সাথে খানা খাওয়ার কারণে কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। এর দ্বারা তোমার ঈমান নষ্ট হতে পারে। অথচ রোগতো আল্লাহ দিয়েছেন। আমরা আমাদের পরিবেশে এর অনেক প্রমাণ দেখতে পাই। বসন্তকে ছোঁয়াচে রোগ বলা হয়। তাই এই ভেবে মানুষ, যার বসন্ত হয় তার থেকে দূরে থাকে। অথচ যে সন্তানের বসন্ত হয়েছে তার মা তাকে গোসল করিয়ে দেয়, খাবার খাওয়ায়, রক্ত-পুঁজ মুছে দেয় এমনকি কোন কোন সময় মায়ের গায়ে

সন্তানের ঘাঁ এর পুঁজ রক্ত লাগে। কিন্তু মায়ের বসন্ত হতে দেখা যায় না। তাই আক্বীদা রাখতে হবে ছোঁয়াচে রোগ নাই, রোগ-বালাই আল্লাহর হুকুমে হয়।

**২. কোন অশুভ নেই**

ইসলামে কোন অশুভ নেই। শুভ আছে। কুরআন শরীফে সূরা ইয়াসীনের ২য় পৃষ্ঠায় এক ঘটনা এসেছে। হাবীবে নাজ্জার নামের এক আল্লাহর অলী তার কওমকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। আর তার কওম শুধু শুভ-অশুভ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। মনগড়া কিছু কাজকে শুভ মনে করতো আর কিছু কাজকে তারা অশুভ মনে করতো। ঐ জমানার লোক তাঁর দাওয়াতকেও অশুভ মনে করতো। আর বলতো খবরদার তার কথা শুনো না। তোমরা যদি তার কথা শুনো তাহলে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব ধ্বংস হয়ে যাবে। হাবীবে নাজ্জার তাদেরকে বললেন 'বাল আনতুম কওমুম মুসরিফুন' তোমরাতো সিমালঙ্ঘনকারী কওম। তোমরা আমার দাওয়াতকে অশুভ মনে করছো। এই ধরনের লোক এখনো আছে। অনেক লোক আছে যারা আলেম-উলামাদের অনেক শ্রদ্ধা করে মুহাব্বাত করে। হাদিয়া পেশ করে দাওয়াত করে খাওয়ায়। হজ্জের টিকিট দিচ্ছে। কিন্তু নিজের ব্যবসা বা চাকরীর হালত আলেমদের কাছে বলে না। কারণ তারা আলেমদেরকে বলা অশুভ মনে করে। ঐ হাবীবে নাজ্জার রা. কওমের মতো এই কথা মনে করে যদি হুযুরকে বলো তো তোমার ব্যবসা বা চাকরী একদম শেষ হয়ে যাবে। এই শুভ-অশুভ খোঁজা হিন্দুদের রীতি। ওরাই পঞ্জিকা বের করে। যাত্রা শুভ না যাত্রা নাস্তি। আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন 'আত তিয়ারাতু শিরকুন'। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। তোমরা যে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করো এটা শিরক। এটা ইমানকে ধ্বংস করে দেয়।

সফর মাসের বদরুসুম অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। জাহিলিয়্যাতের যামানা থেকে এই শুভ-অশুভ চিন্তা করার রীতি চালু ছিলো। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে তা এখনো আমাদের সমাজে জারি আছে। অথচ এই সকল আক্বিদা আমাদের ঈমান ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। যেমনঃ কারো কোন কাজ অসম্পূর্ণ হলে বলে উঠে আজ সকালে কার চেহারা দেখে ঘর থেকে বের হয়েছি!, আবার কাজে বের হতে গেলে সামনে দিয়ে সাপ গেলে মনে করে আজ আর তার কাজ ঠিক মতো হবে না, ঘর থেকে বের হয়ে কোন অন্ধ লোকের দিকে নজর গেলে কু-লক্ষণ মনে করে ইত্যাদি। এর সবই স্পষ্ট শিরক।

অনেকে মুহাররম মাসে বিয়ে করতে চায়না। এই মাসে ইমাম হুসাইন রা. শহীদ হয়েছেন বলে তারা এই মাসে বিয়ে করাকে অশুভ মনে করে। এই ধারনাও শরীয়ত বিরোধী।

এই ধরনের অশুভ ধারনা করা শরীয়ত সম্মতী দেয় না। তবে শুভ দিকের আলামত রয়েছে। এতে নিষেধ নাই। কারণ এতে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করা হয়। যেমনঃ কেউ ঘর থেকে বের হলো কোন কাজের উদ্দেশ্যে আর পথে কোন আল্লাহওয়ালার সাথে দেখা হলো তো ধারনা করলো যে তার কাজে আল্লাহ বরকত দিবেন ইনশাআল্লাহ। এমন ধারনা শরীয়ত সম্মত ধারনা। যেমনঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি করার সময় মক্কার কয়েকেজন নেতা কাফেরের পক্ষ থেকে সন্ধি নিয়ে এসেছিলো কিন্তু একবারও বনিবনা হচ্ছিল না। এরমধ্যে চতুর্থবার কাফেরের পক্ষ থেকে যে নেতা আসছিলো তাকে দূর থেকে দেখেই আল্লাহর রাসূল সা. বললেন, সূহাইল যেহেতু আসছে এখন আমাদের এই কাজ সহজ হয়ে যাবে। কারণ "সুহাইল" শব্দের অর্থ "সহজ"। তার নামের দিকে ইশারা করে ভাল লক্ষণ বের করলেন। এবং সত্যি তাই হয়েছিলো। তাই ভালো লক্ষণ বের করা আল্লাহর রহমতের আসা করার মত।

**৩.পূনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা**

জাহিলিয়্যাতের যুগে মানুষ মনে করতো যে তারা কেউ মারা গেলে আবার তারা দুনিয়াতে অন্য কোন প্রাণীর রূপ নিয়ে আসবে। বর্তমানেও অনেক মুসলমান এমন মনে করে তবে একটু ভিন্ন তরীকায়। যেমন অনেকে রাতে পানি ফেলে না। কারণ তাদের ধারনা তাদের আত্মীয় স্বজন যারা মারা গেছেন তারা রাতে বাসার আশে-পাশে চলে আসেন এবং তাঁরা দেখেন কেউ তাদের জন্য সাওয়াব রেসানি করছে কিনা। তাই যদি পানি ফেলি তাহলে তাদের গায়ে লাগলে কষ্ট পাবে এবং আমাদেরকে বদদূ'আ দিবেন।

**৪. সফর মাসকে অশুভ মনে করা**

বর্তমান মাসের নাম হলো صفر 'সফর'। আর আমরা যে এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় ভ্রমণ করি একে বলে سفر 'সফর' । বাংলায় এক হলেও আরবী বানান ভিন্ন। এবং অর্থও ভিন্ন। জাহিলিয়্যাতের যামানায় মনে করা হতো এই মাসে কোন খায়ের ও বরকত নেই। তাই তারা এই মাসে কোন সফর করতো না। আর তখন তাদের সফরের উদ্দেশ্য থাকতো ব্যবসা। ঐ যামানায় তারা গরমের দিনে উত্তর দিকে ব্যবসা করতে যেতো। ঐ দিকে পাহাড় ছিলো। তাই ঐ সময় ঐ দিকটা একটু আরাম ছিলো। আবার শীতের দিনে তারা ইয়েমেনে (এডেন) সফর করতো। ঐ সময় ওখানে সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় আরাম থাকতো। সারা বছরে তারা দুটা সফর করতো। আল্লাহ কুরআনে বলে দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে সারা বছরের রিযিক দুই সফরে সম্পূর্ণ করে দিই। (রিহ লাতাশ শিতাই ওয়াস সইফ-সূরা কুরইশ)

কখনো যদি তাদের গরম বা শীতের কোন সফরের সময় (ব্যবসায়িক ভ্রমণের সময়) আরবী সফর মাস চলে আসতো তখন তারা তাদের এই সফরকে শুভ মনে করতো না। তাদের ধারনা মতে এই সফরে তাদের ক্ষতির আশংকা আছে। কিন্তু সফরতো (ভ্রমণ) আর বন্ধ করার কোন রাস্তা নাই। কেননা এই সফরে তাদের বছরের অর্ধেক কামাই। যেহেতু তারা শীত বা গরম আসার আগেই গণনা করতো যে তাদের এই সফরে,আরবী সফর মাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই তাদের গোত্রের নেতারা এক সাথে বসে মিটিং করতো। মিটিং-এ নির্ধারণ করতো এবার সফর মাসকে পিছিয়ে দেয়া হোক। অর্থাৎ মুহাররম মাসের পরে এবার রবিউল আউয়াল মাস আসবে তারপরে সফর মাস গণনা করা হবে।

আর তারা ধারনা করতো তারা মুহররম মাসের পরের মাস রবিউল আউয়াল মাসে সফর করছে। এভাবে নিজেকে বুঝ দিয়ে অশুভ ধারনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতো। তারপর ব্যবসায়িক সফর থেকে ফিরে এসে সফর মাসের ঘোষণা করতো। তাদের এই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে দশম পারায় আয়াত নাযিল হলোঃ 'ইন্না মান নাসিউ যিয়াদাতিন ফিল কুফর'। তোমরা যে তোমাদের ইচ্ছামতো মাসকে আগে-পিছে করো এটা কুফরি কাজ।

আমাদের সমাজে এমন আরো অনেক কুলক্ষণ-সুলক্ষণ বের করে তার উপর আমল করে যা সম্পূর্ণ শিরক বা কুফর। নিম্নে এর একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

**শরী'আতের আক্বীদা বিরুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কু-লক্ষণের তালিকা**

১. হাতের তালু চুলকালে অর্থকড়ি আসবে মনে করা।
২. চোখ লাফালে বিপদ আসবে মনে করা।
৩. কুত্তা কান্নাকাটি করলে রোগ বা মহামারী আসবে মনে করা।
৪. এক চিরুনিতে দু'জন চুল আঁচড়ালে এই দু'জনের মাঝে ঝগড়া লাগবে মনে করা।
৫. কোন বিশেষ পাখি ডাকলে মেহমান আসবে মনে করা।
৬. যাত্রাপথে পেছন থেকে কেউ ডাকলে যাত্রা খারাপ হবে মনে করা।
৭. যাত্রা পথে হোঁচট খেলে বা মেয়র দেখলে বা কাল কলসি দেখলে কিংবা বিড়াল দেখলে-কু-লক্ষণ মনে করা। অমুক দিন যাত্রা নাস্তি, অমুক দিন ভ্রমণ নাস্তি ইত্যাদি বিশ্বাস করা। মোটকথা কোন দিন বা কোন মুহূর্তকে অশুভ মনে করা।
৮. যাত্রার মুহূর্তে কেউ তার সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না-এমন বিশ্বাস করা।
৯. পেঁচা ডাকলে ঘরবাড়ি বিরান হয়ে যাবে মনে করা।
১০. জিহ্বায় কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে মনে করা।
১১. চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে মনে করা।
১২. দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকি দিলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে মনে করা।
১৩. কোনো লোকের আলোচনা চলছে, এই ফাঁকে বা এর কিছুদিন পরে সে এসে পড়লে এটাকে তার দীর্ঘজীবী হওয়ার লক্ষণ মনে করা।
১৪. কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হলে সেই ঘরের মালিক ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবে মনে করা।
১৫. আসরের পর ঘর ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা।
১৬. ঝাড়ু দ্বারা বিছানা পরিস্কার করলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে মনে করা।
১৭. কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চা মারা যাবে মনে করা।
১৮. ঝাড়ুর আয়াত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে মনে করা।
১৯. কোন প্রাণী বা প্রাণীর ডাককে অশুভ বা অশুভ লক্ষণ মনে করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ ধরণের আরো অনেক ভুল বিশ্বাস আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। সেসব থেকে মাত্র কয়েকটি এখানে বাছাই করে উল্লেখ করা হল। এসব নেয়া হয়েছে "আগলাতুল আওয়াম" গ্রন্থ থেকে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর রেওয়াতে একটি হাদীস এসেছে "জাহিলিয়্যাতের যামানায় যেমন মানুষ বিভিন্ন কু-লক্ষণ চিন্তা করে। আমাদের মনে ঐ চিন্তা আসতে পারে। এটা শয়তানের পক্ষ থেকে এক ধরনের ওয়াসওয়াসা। আমরা তা আমলে নিবো না।" আমলে না নিলে আমাদের ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। আমলে নিলেই ঈমানের ক্ষতি।

আমাদের সমাজে এ-সম্পর্কিত আরো কিছু আক্তীদা রয়েছে যা ঈমান বিধ্বংসী। যেমনঃ

**রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আক্বীদা**

রাশি হল সৌর জগতের কতগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয়। যথা- মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র [অর্থাৎ ফলিত জ্যোতিষ বা Astrologie এর ধারণা অনুযায়ী এসব গ্রহ নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যৎ শুভ-অশুভ সংঘটিত হতে পারে। এভাবেই শুভ অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আক্বীদা অনুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোনো প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। [সূরা-আনআম,আয়াত-৫৭]

সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে, এই আক্বীদা রাখা শিরক। তবে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোনো প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। কুরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। যদি প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোনো প্রভাব থাকেও তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। অতএব, শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও তারই নিয়ন্ত্রণে। [সূত্র : ফাতহুল মুলহিম।]

**রত্ন ও পাথরের প্রভাব বিষয়ে আক্বীদা**

মণি, মুক্তা, হিরা, চুনি, পান্না, আকীক প্রভৃতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে-এরূপ আক্বীদা বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ, মুসলমানদের নয়। [সূত্র : আপকে মাসাইল আওড় উনকে হল।]

**হস্ত রেখা বিচার বিষয়ে আক্বীদা**

পামিষ্ট্রি (Pamistry) বা হস্তরেখা বিচার বিদ্যার মাধ্যমে হাতের রেখা ইত্যাদি দেখে ভাগ্যের বিষয়ও ভূত-ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেয়া হয়, ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা কুফরী। [সূত্র:আপকে মাসাইল আওড় উনকে হল, প্রথম খণ্ড।]

**নজর ও বাতাস লাগার বিষয়ে আক্বীদা**

# হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী নজর লাগার বিষয়টি সত্য। জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনজর লেগে গেলে তার ক্ষতি সাধন হতে পারে। আপনজনের প্রতিও আপনজনের বদনজর লাগতে পারে। এমনকি সন্তানের প্রতিও মা-বাবার বদনজর লাগতে পারে। আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন-ভূতের বাতাস অর্থাৎ তাদের খারাপ নজর বা খারাপ আছর লাগা, তা হলে এটাও সত্য। কেননা, জিন-ভূত মানুষের ওপর আছর করতে সক্ষম।

# কেউ কারো কোন ভালো কিছু দেখলে যদি মাশাআল্লাহ বলে তা হলে তার প্রতি বদনজর লাগে না। আর কারো ওপর কারো বদনজর লেগে গেলে যার নজর লাগার সন্দেহ হয় তার মুখ হাত [কনুইসহ] হাঁটু এবং ইসতিনজার জায়গা ধুয়ে সেই পানি যার ওপর নজর লেগেছে তার ওপর ঢেলে দিলে আল্লাহ চাহে তো ভালো হয়ে যাবে। বদনজর থেকে হিফাযতের জন্য কাল সূতা বাঁধা বা কালি কিংবা কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন এবং কুসংস্কার।

**তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে আক্বীদা**

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়-হতেও পারে নাও হতে পারে। যেমন দু'আ করা হলে রোগ ব্যাধি আরোগ্য হতেও পারে নাও হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মর্জি হলে আরোগ্য লাভ হবে, তা না হলে নয়। এমনিভাবে তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকও একটি দু'আ। মনে রাখতে হবে তাবীজের চেয়ে কিন্তু দু'আ আরো বেশি শক্তিশালী। তাবীজ এবং ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলেও সেটা তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই তা হয়ে থাকে।

# সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকই ইজতিহাদ এবং কুরআন থেকে উদ্ভূত, কুরআন ও হাদীসে যার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, অমুক তাবীজ বা অমুক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাজ হবে। অতএব, কোনো তাবীজ বা কোন ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাঙ্খিত ফল লাভ না হলে এরূপ বলার বা এমন ভাবার অবকাশ নেই যে, কুরআন ও হাদীস কি তা হলে সত্য নয়?

# যেসব বাক্য বা শব্দ কিংবা যেসব-নকশার অর্থ জানা যায় না, তার দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়।

# কোন বিষয়ের তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় রয়েছে বা বিশেষ কোন শর্ত ইত্যাদি রয়েছে-এমন মনে করা ঠিক নয়।

# তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারো অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক-এমন ধারণা করাও ভুল।

# তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা ভালো আছর হলে সেটাকে তাবীজদাতার বা আমিলের বুযুর্গী মনে করা ঠিক নয়। যা কিছু হয় সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। [সূত্র: ফাতাওয়া শামী।]

আর মনে রাখতে হবে ঈমান না থাকলেতো তার কোন আমলই আল্লাহর নিকট পৌঁছাবে না। একে ভালো কাজ বা নেক আমল বলা যাবে না। ভালো কাজ করলেই তাকে ভালো কাজ বলা যায় না। শরীয়তের ভাষায় ভালো কাজের সংজ্ঞা ভিন্ন। প্রথমতঃ তার বিশুদ্ধ ঈমান থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর হুকুম থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ নবীর সা. তরীকা থাকতে হবে। ঈমানহীন ব্যক্তির বা শিরকযুক্ত ঈমানওয়ালার কোন ভালো কাজ তথা-নামায, রোজা, দান-সদকা কিছুই ভালো কাজ হিসেবে ধরা হবে না। এর কোন নেকী সে পাবে না। শর্ত হলো ঈমান।

তাই ঈমান কী কী কারণে নষ্ট হয়ে যায় তার ইলম থাকতে হবে। যেন ঈমানের হেফাজত করতে পারি। । ঈমানের কিতাবের তালিম হতে হবে ঘরে-ঘরে, মসজিদে-মসজিদে। (এর জন্য লেখক মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এর কিতাব "কিতাবুল ঈমান" খুবই উপকারী)